দৈনিক ইনকিলাব
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
015 তারিখ 04 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

সমাজের দুশমন

[illegible] ফারুক মাহমুদ তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার প্রথমেই একটি বর্ণনা দিয়েছেন—

04 FEB 1987

বামেতে তাকালে দেখি
বামাপন্থী কামাচার্য
কামনিষ্ঠ কামরেড কামেল
বিপ্লব-বিলাসে দিনে উন্মাতাল
রাতে বন্দী কামিনী-কাঞ্চনে

এই বর্ণনায় (অপ্রিয় কবিতাগুচ্ছ, নয়া দুনিয়া পাবলিকেশনস, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৮৬) এমন এক শ্রেণীর মানুষের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে যারা এ দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে সংখ্যায় অতি নগণ্য, অধিকাংশ অশিক্ষিতের দেশে যথেষ্ট শিক্ষিত এবং চিন্তা-চেতনায় ও তা প্রকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয়। প্রশাসন, শিক্ষকতা, রাজনীতি এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তাঁদের বিচরণ বেশী দেখা যায়। তাঁরা এই দেশের মানুষ হয়েও চিন্তা-চেতনায় ভিন্ন দেশের বাসিন্দা এবং সেই ভিন্ন দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতা-রাজনীতি এ দেশে আমদানীর জন্য সর্বদা তৎপর। তাঁরা এই মাটির রস শোষণ করে এই মাটির মানুষের মধ্যেই বেঁচে থাকেন এবং বেড়ে ওঠেন। কিন্তু এখানকার মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁদের বড়ই অবজ্ঞা, বড়ই তাচ্ছিল্য। বাপ-দাদার ঈমান-আমান, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতিকে তাঁরা মনে করেন সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং পশ্চাৎমুখীনতা। কেন এমন হয়? এ দেশের অধিকাংশ মানুষের নসিবে যা জোটে না সেই দুর্লভ ও দুর্মূল্য শিক্ষা এবং বিশেষত উচ্চ শিক্ষা লাভ করেও তাঁরা পরাশ্রয়ী এবং আত্ম সমভ্রমহীন হয়ে যান কেন? নিজের বাপ-দাদাকে পর করে দিয়ে পরের বাপ-দাদাকে আপন বলে আঁকড়ে ধরেন কেন? আত্মীয়কে অপমান করে অনাত্মীয়কে সম্মান করেন কেন?

লক্ষণীয় যে, কোনও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই হীনমন্যতা এবং পরমুখাপেক্ষিতা নেই। এবং এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় যে, আমাদের শিক্ষার মধ্যেই এমন কিছু আছে যেখানে এই রোগের মূল কারণ নিহিত। সেই মূল কারণ হচ্ছে ধর্মহীনতা। ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা।

বাংলাদেশের শতকরা একশ' জন মানুষই ধর্মবিশ্বাসী। তাদের জীবনের প্রত্যেকটি কার্যকলাপ, প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অথচ আশ্চর্য! তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মের কোনও স্থান নেই। মুসলিম প্রধান এই দেশে এই ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা মুসলমানদের জন্যই সবচেয়ে বেশী বিপর্যয় ডেকে এনেছে। সম্প্রতি ঢাকায় ছাত্র হিজবুল্লাহ্‌র বার্ষিক কেন্দ্রীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে কবি রূহুল আমীন খান যে কথা বলেছেন, তাতে এই বিপর্যয়ের একটি ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণী থেকে এমএ পর্যন্ত পাঠ্যসূচীর কোথাও ইসলাম সম্পর্কে জানার আদৌ কোনও সুযোগ রাখা হয়নি। তার ফলে একদিকে ছাত্র সমাজ যেমন ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে অপরদিকে তেমনি কিছুটা ঐ পাঠ্যসূচীর মারফতে এবং কিছুটা পরিবেশগত প্রভাবে সম্পূর্ণ বিজাতীয় ও বিধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা অবশ্য সাম্প্রতিককালে সৃষ্টি হয়নি। আজ থেকে ১৫৫ বছর আগে এই ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছিল।

খৃস্টান ইংরেজগণ ভারতবর্ষে শুধু মুসলিম শাসনই উৎখাত করেনি তাদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাও সমূলে উচ্ছেদ করেছিল। ইংরেজ শাসন মোটামুটি নিরাপদ হওয়ার পর বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেনটিংক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধনের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটির নাম ছিল জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন। কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন লর্ড টমাস ব্যাবিংটন মেকলে। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন স্যার চার্লস ট্রেভিলিয়ান, মিঃ বাসলে কোলভিন, স্যার চার্লস মেটকাফ প্রমুখ। এই কমিটিতে স্থির করা হয় যে, ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হবে "নেটিভদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে এমন ইংলিশ জেন্টলম্যান সৃষ্টি করা যারা কালক্রমে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় বৃটিশ শাসকদের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।" একবার এই লক্ষ্য স্থির হয়ে যাওয়ার পর কমিটির কাজ অনেক-সহজ হয়ে যায়।

কোনও কোনও সদস্য অবশ্য পাঠ্যসূচীতে ধর্ম শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার বিধান রাখার কথা বলেন। তাঁরা বলেন যে, শিকড়হীন শিক্ষা ব্যবস্থা কখনও মঙ্গলজনক হতে পারে না এবং সেই জন্যই ধর্মীয় শিক্ষা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু চেয়ারম্যান লর্ড মেকলে বলেন—"ইসলাম ইজ এ ফলস রিলিজিয়ন, হিন্দুইজম মোর ফলস (ইসলাম একটি মিথ্যা ধর্ম, হিন্দুধর্ম আরও মিথ্যা)। সুতরাং ভবিষ্যতের ইংলিশ জেন্টেলম্যানদের ঐসব মিথ্যা ধর্ম শিক্ষা দেয়া যেতে পারে না।" শেষ পর্যন্ত মেকলে সাহেবের এই অভিমতই কমিটিতে গৃহীত হয় এবং লর্ড উইলিয়াম বেনটিংকে কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে মোগল শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে ১৮৩৪ সালে ভারতবর্ষে ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন (ল্যাইফ অব লর্ড উইলিয়াম বেনটিংক, উইলিয়াম উইলসন হান্টার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লণ্ডন, ১৮৯২)। এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার বেশ কিছুদিন পরে ভারতের নেতৃস্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানগণ যখন তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করলেন তখনই তাদের খেয়াল হল যে, কতবড় ক্ষতি তাঁদের হয়ে গিয়েছে। তাঁরা এই ব্যবস্থায় আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতের শাসনভার গ্রহণের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবাসীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ না থাকায় প্রকৃত প্রস্তাবে সেই হস্তক্ষেপই করা হয়েছে। এই আপত্তির কারণে পরবর্তীকালে মুসলমানদের জন্য পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা এবং হিন্দুদের জন্য পৃথক টোল শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পাঠ্যসূচী থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের মত বিষয় সযত্নে বাদ দেয়া হয়। মুসলমানগণ গোনাহ মাফ ও সওয়াব হাসেলের পন্থা উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকুক, হিন্দুগণ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে ভবনদী পাড়ি দিয়ে বৈতরণী পার হয়ে স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা তালাশ করুক কিন্তু দেশের রাজনীতি বা অর্থনীতিতে যেন মাথা গলাতে না আসে, মাদ্রাসা ও টোল শিক্ষা প্রবর্তনের পিছনে এ-ই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

লক্ষণীয় যে, মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই দুই প্রকারের শিক্ষা ব্যবস্থাই চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। ইংরেজী শিক্ষা তাদের ইসলাম থেকে কেবল বিচ্ছিন্নই করে দেয় না বরং পুরোপুরি ইসলাম বিরোধী করে তোলে। একইভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ধর্মের নামে কিছু জীবন-বিচ্ছিন্ন আচার-অনুষ্ঠান মাত্র শিখিয়ে তাদের পুরোপুরি সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষে পরিণত করে।

সেই বন্দোবস্ত এখনও অবিকল বহাল আছে। এখনও একজন মুসলিম ছাত্র চিকিৎসাশাস্ত্রে এমবিবিএস পাস করে এসেও ইবনে সিনার নাম জানে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচডি করে এসেও দুনিয়ার প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে মদিনায় প্রতিষ্ঠিত দুনিয়ার প্রথম বহুধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের খবর রাখে না। মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়ে কৃতিত্বের সঙ্গে অতিক্রম করে এসেও কৃষকের পাটের জন্য ন্যায্যমূল্য আদায়ের সংগ্রামকে জেহাদ বলে মনে করে না। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করাকে সুন্নত বলে গণ্য করে না। অথচ ইতিমধ্যে আমরা সেই ইংরেজদের তাড়িয়েছি, একবার নয় দুইবার স্বাধীন হয়েছি এবং নিজেদের শাসন ব্যবস্থা নিজেরাই পরিচালনা করছি। দেশে স্কুল-কলেজ, মক্তব-মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-প্রশাসকের সংখ্যা বেড়েছে এবং শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই মেকলের মকর থেকে আমরা এখনও বেরিয়ে আসতে পারিনি। প্যাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে অনেক শিক্ষা কমিশন হয়েছে, অনেক সুপারিশ তৈরী হয়েছে, এখানে-সেখানে কিছু কিছু রদবদলও হয়েছে। কিন্তু সবকিছু হয়েছে ঐ মেকলের কাঠামোর মধ্যেই। তার বাইরে আসা যায়নি। বাইরে আসার কোনও চিন্তাও কখনও করা হয়নি, চেষ্টাও কখনও করা হয়নি। তার ফল যা দাঁড়িয়েছে একজন মার্কিন পণ্ডিত সম্প্রতি তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। কানেকটিকাটের হার্টফোর্ড সেমিনারির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর ইভোন ইয়াজদেক হাদ্দাদ বলেছেন—"ইসলামের প্রথম এক হাজার বছরে তার গতিরোধের জন্য খৃষ্টানগণ যে সফলতা অর্জন করতে পারেনি মুসলিম দেশে একমাত্র ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেই গত দুইশ' বছরে তারা তার চেয়ে অনেক বেশী সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ঐ শিক্ষা ব্যবস্থার কারণেই তারা তাদের এমন কিছু এজেন্ট ঐ সকল দেশে রেখে যেতে পেরেছে যারা নামে ও জন্মসূত্রে মুসলমান কিন্তু ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনায় খৃস্টান। তারাই এখ[illegible] ঐ সকল মুসলিম দেশের শিক্ষ[illegible] অর্থনীতি ও প্রশাসন পরিচালনা কর[illegible] এবং সেখানে যাতে ইসলা[illegible] অনুপ্রবেশ না ঘটে সেদিকে সতর্ক[illegible] রাখছে। ফলে, ইসলামের বি[illegible] এখন খৃস্টানদের আর নি[illegible] লড়াই করতে হচ্ছে না। তাদে[illegible] এজেন্ট ঐ খৃষ্ট-মুসলিমগণই[illegible] লড়াই করে দিচ্ছে।" (দি মিড[illegible] জার্নাল, ভল্যুম-৩৭, ১৯৮৩[illegible]

মেকলে সাহেব যে কত সুদ[illegible] চিন্তা করে এ দেশে ধর্মহী[illegible] ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলে[illegible] বিশ্লেষণ থেকেই তা পরি[illegible] যাবে। কিন্তু এই বিপদ[illegible] ভয়াবহতা আমরা উপল[illegible] পেরেছি কি? শিক্ষাম[illegible] মাহবুবুর রহমান সম্প্র[illegible] ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্ত[illegible] জাতীয় পর্যায়ে যে [illegible] বলেছেন, সেখানে [illegible] বিবেচিত কিম্বা আদৌ [illegible] কি?

ZILLA BELKUCHI DISTRICT SERAJGANJ TEACHER